তাদের মধ্যে মধুময় সম্পর্ক

[নবী-পরিবার ও অবশিষ্ট সাহাবীগণ পরস্পর সহানুভূতিশীল]

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

শাইখ সালেহ ইবন আবদিল্লাহ আদ-দারওয়ীশ

অনুবাদ: ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ড. মোঃ আব্দুল কাদের

رحماء بينهم [التراحم بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم]

الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش

৯৩

ترجمة: د/ محمد أمين الإسلام
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا
د/ محمد عبد القادر

IslamHouse.com

সূচীপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	
২	আহ্বান	
৩	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গুণাবলী	
৪	নামকরণের তাৎপর্য	
৫	উপলব্ধি করবে কি?	
৬	পর্যালোচনা	
৭	বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা	
৮	প্রশংসা ও গুণগানের তাৎপর্য	
৯	আলে বাইত-এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের অবস্থান	
১০	আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের আকিদা	
১১	নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান	
১২	অনুচ্ছেদ	
১৩	উপসংহার	
১৪	হাশিমী বংশ ও বাকি 'আশারা মুবাশ্বারা বিল জান্নাত'-এর মধ্যে	

	বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক	
১৫	হাশিমী বংশ ও বাকি 'আশারা মুবাশ্বারা বিল জান্নাত'-এর মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার অনুসারী	

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، و من يضلل فلا هادي له

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের সমস্ত বিপর্যয় ও কু-কর্ম থেকে রক্ষার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শনকারী নেই।)

অতঃপর...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম সন্তানের নেতা, এই নীতির ওপর ইসলামপন্থীগণ সম্মিলিতভাবে ঐক্যমত পোষণ করেন। আর এ ধরণের ঐক্যমত এ

জাতির জন্য বড় নি'আমত। সমস্ত প্রশংসা ও করুণার মালিক আল্লাহ।

উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন যে ব্যক্তি জ্ঞানগত বা অন্যান্য বিষয়ে কোনো কোনো ইমামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মর্যাদা দিয়ে থাকে[1], তার পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই। কারণ, বই-পুস্তকে সংকলিত এই বর্ণনাগুলোর কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন, আবার কেউ এগুলোকে দুর্বল বর্ণনা বলে মন্তব্য করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান-মর্যাদার ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হচ্ছে, তিনি মহান শাফা'আত ও হাউজে কাউসারের অধিপতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করে না।

---

[1] মাজলেসী তার বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে "বাবু আন্নাল আয়িম্মাহ আ'লামু মিনাল আনবিয়া" বা "ইমামগণ নবীদের চেয়েও অধিক জ্ঞানী" শীর্ষক একটি শিরোনাম রচনা করেছেন। খ. ২, পৃ. ৮২। আরও দেখুন, উসূলুল কাফী, খ. ১. পৃ. ২২৭।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতসমূহ স্থানান্তরিত হয়েছে তাঁর নিকটাত্মীয় পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের নিকট। তবে আহলে বাইত (নবী পরিবার)-এর মর্যাদা বেশি। এ প্রসঙ্গে বহু আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতির রয়েছে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য যারা লাভ করেছেন, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে সাহাবীদের মধ্যে আহলে বাইতের সদস্যবৃন্দ প্রথম সারির সাহাবী হিসেবে গণ্য।

প্রথম পুস্তিকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবত বা সাহচর্য প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ পুস্তিকায় ঐসব সাহাবীর পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের উচিৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবত, তাঁর মর্যাদা ও সাহেবে বরকতের সাথে তাদের সাহচর্য প্রসঙ্গে আলোচনায় বিরক্তি প্রকাশ না করা; যার প্রতি ঈমান ও সাহচর্যের কারণে সাহাবীগণ 'সাহাবী' উপাধিতে ধন্য হয়েছেন। তাদের আমল ও সাইয়্যিদুল মুরসালীনের সাথে জিহাদী তৎপরতার ওপর ভিত্তি করে জান্নাতে তাদের

মান-মর্যাদা বিভিন্ন রকম হবে। অনুরূপভাবে দুনিয়াতেও মুহাজির, আনসার ও অপরাপর সাহাবীদের মধ্যে মান-মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। তবে প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [الحديد: ١٠]

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০]

তবে সাহাবীদের সকলের জন্য রয়েছে বিশেষ মান-মর্যাদা। আমাদের উচিৎ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করা। এই মর্যাদা সত্তাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের মর্যাদা

তাদের কর্মতৎপরতার আলোকে বিন্যস্ত। সুতরাং তাদের স্তরসমূহ হচ্ছে:

প্রথমত: সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ। তারা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ যার মধ্যে তাঁর রাসূলের সহবত ও আত্মীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছেন, তিনিই নবী পরিবার বা পবিত্র 'আহলে বাইত'-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক, আল্লাহ তাদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট। তাদের জন্য রয়েছে একদিকে সাহচর্যের মর্যাদা, অপরদিকে আত্মীয়তার অধিকার। আর তাদের কর্মতৎপরতার আলোকে তাদের মর্যাদা নির্ধারিত।

সম্মানিত পাঠক:

নিশ্চয় জাতির অনৈক্যের কারণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা একটি শর'ঈ দাবি। আমার আলোচনা একটি বড় ধরণের সমস্যা নিয়ে, যার প্রভাবে উম্মতের ওপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। অচিরেই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী তথা আহলে বাইত ও

অপরাপর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সহানুভূতিশীল সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব। এক পর্যায়ে তাদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছ সত্য, তবে তারা ছিলেন নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। এটাই বাস্তব কথা, যদিও গল্পকারগণ এ বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করেছে, আর ঐতিহাসিকগণ ছিল সত্য প্রকাশে নিশ্চুপ। অথচ এ সত্যটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বিদ্যমান রয়েছে, যা অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মনগড়া ইতিহাসের জবাব দেবে, যে ইতিহাসকে স্বার্থান্বেষী মহল ও শত্রুপক্ষ তাদের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং উম্মতের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহার করছে।

আহ্বান:

জাতির ইতিহাস লেখক ও গবেষকবৃন্দ, এমন কি দীনের দা‘ঈদেরকে এক কথায় ও একই সারিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আর যারা বিশ্বায়নের ক্ষতি ও প্রভাব সম্পর্কে এবং যারা এর প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য এক কাতারে দাঁড়ানো অবশ্য কর্তব্য মনে করে থাকেন তাদের প্রতিও এ আহ্বান।

তাছাড়া এ জাতির প্রত্যেক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলছি, ঐতিহাসিক মাসআলা ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং যা শত্রুতার দিকে নিয়ে যায়, এমন বিষয় কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কেন আমরা প্রচার করে বেড়াচ্ছি? সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য, না কি অন্ধ অনুসরণের কারণে, না কি বস্তুগত সুবিধা হাসিলের জন্য!!

অনেক লেখক ও গবেষককে দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন, যারা অত্যন্ত দুর্বল ও মনগড়া বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ঐতিহাসিক মাসআলা-মাসায়েল ও চিন্তা-দর্শনের পেছনে বহু সময় ব্যয় করেন এবং যার পর নাই চেষ্টা-সাধনা করেন। এমন কি তাদের মধ্যে এমন লেখক বা গবেষক রয়েছেন, যিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি একটি

মহৎ কাজ করছেন এবং প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হবেন!!! অথচ তাদের অর্জিত চিন্তা-দর্শনে উম্মতের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি সৃষ্টি করার উপকরণ ছাড়া কিছুই নেই। যখন আপনি তাদেরকে তাদের চেষ্টা-সাধনার ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন কোনো জবাব পাবেন না!! আরও মজার ব্যাপার হলো তাদের কেউ আপনাকে বলবে, জ্ঞানের জন্য এই চেষ্টা-সাধনা!!! এখানে কোথায় জ্ঞানগত ভিত্তি যার ওপর নির্ভর করা যায়?

الصحبة (সাহচর্য) নামক পুস্তিকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সাহচর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তাঁর রিসালাতে বিশ্বাসী নিরক্ষর ব্যক্তিদের পরিশুদ্ধ করা, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও তাঁর সহবত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِى ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: ٢]

“তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত, ইতঃপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব ব্যক্তিবর্গকে হিদায়াত ও সম্প্রীতির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

পূর্বে আলোচিত[2] বিষয়গুলো হলো: সেনাপতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সৈনিকদের মধ্যে সাহচর্য, আদর্শ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও

---

[2] প্রথম পুস্তিকার শিরোনাম, “সুহবাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম”।

তাঁর আদর্শের অনুসারীগণ, প্রতিবেশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রতিবেশিত্বে বসবাসকারীগণ এবং রাষ্ট্রপতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রজাগণ। তারা সকলেই তাঁর প্রিয় সহচর।

সম্মানিত পাঠক:

আপনি নিঃসন্দেহে জানেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাত পৌঁছানো, তাঁর সাহাবীদের পরিশুদ্ধকরণ, তাদেরকে প্রশিক্ষণ-দান ইত্যাদি সংক্রান্ত যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তা তিনি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। এই তা‘লীম-তরবীয়তের ফলেই এতসব প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সাহাবীদের স্বভাবগুণে পরিণত হয়েছে। হয়েছেন তারা মানবজাতির কল্যাণে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ﴾ [ال عمران: ١١٠]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: (أُخْرِجَتْ) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে প্রশ্ন জাগে, কে তাদের আবির্ভাব ঘটালেন এবং কে তাদেরকে এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন? আর ইহা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই বাণীর মতো:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ﴾ [البقرة: ١٤٣]

“এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

আল্লাহ তা‘আলা তাদের গুণগান ও প্রশংসায় অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আর তাদের অবস্থান ও মান-মর্যাদার কিছু দিক এবং সে প্রসঙ্গে নাযিলকৃত আয়াতের আলোচনা পূর্বে হয়েছে। সুতরাং পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গুণাবলী

সম্মানিত পাঠক:

মনে রাখবেন, এই অনন্য প্রজন্ম যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তা অন্যদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আভিজাত্যপূর্ণ সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন।

তিনি তাদেরকে তা'লীম-তরবিয়তের পাশাপাশি শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আর তারাও তাঁকে সাহায্য করেছেন।

তাদের গুণাবলী থেকে একটি গুণের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকব। আপনার উচিৎ তা পাঠ করা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। তার আলোচনায় সম্মান অর্জিত হবে এবং মুসলিমগণ উপলব্ধি করতে পারবে তাদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্তির কারণ। আপনি কি জানেন ঐ গুণটি কী? সে গুণটি হলো দয়া বা সহানুভূতি।

প্রশ্ন হচ্ছে: ঐ গুণটি নিয়ে কেন আলোচনা করছি?

হে প্রিয় পাঠক! আপনি কি আমার সাথে ভেবে দেখবেন এই প্রিয় গুণটির তাৎপর্য সম্পর্কে? তাহলে সন্দেহাতীতভাবে আপনি এই আলোচনার বহু কারণ পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই পুস্তিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি|

প্রথম কারণ:

দয়া একটি মৌলিক গুণ, যার মধ্যে অনেক অর্থের সমাবেশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বহু আয়াত, সাইয়্যিদুল আবরার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পক্ষ থেকে অনেক হাদীস ও আছার বর্ণিত রয়েছে। আর আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত বর্ণনায় বলেন,

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨]

“অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।” [সূরা আল-কুরআন, আয়াত: ১২৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من لا يَرحم لا يُرحم»

“যে দয়া করবে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না”।[3]

এই মৌলিক গুণ নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। আর এ প্রসঙ্গে বর্ণিত নসের[4] সংখ্যা অনেক, যা আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় কারণ:

---

[3] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

[4] নস হচ্ছে আল-কুরআনের আয়াত ও হাদিস।- অনুবাদক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রশংসায় এই গুণটি পছন্দ করেছেন। আর অন্য গুণ বাছাই না করে এই গুণটি বাছাই করার পেছনে অনেক হিকমত ও উপকারিতা রয়েছে। তাদেরকে এই গুণে গুণান্বিত করাটা জ্ঞানগত মু‘জিযাবিশেষ।

এ বিষয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করবে, তার জন্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে যে, এটা এক বিশেষ মু‘জিযা। কারণ, দয়ার গুণটি যে সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তা বুঝানোর জন্য নসের মাধ্যমে এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা না হলে কেন আল্লাহ তা‘আলা অন্য গুণের কথা না বলে এই গুণটির উল্লেখ করলেন? কেননা, এর মধ্যে সমালোচকদের জবাব রয়েছে, যা অন্যান্য গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লিখিত হয় নি। গল্পকারগণ ও তাদের পরবর্তীদের কথার উত্তরও এর মধ্যে নিহিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু‘ ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

তৃতীয় কারণ:

এই বাস্তব বিবরণ অর্থাৎ তাঁর সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। দয়ার গুণটি তাদের অন্তরে সুদৃঢ়। এই বাস্তবতা ঐসব বর্ণনা, উপকথা ও সন্দেহ-সংশয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে চিত্রায়িত করেছে যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংস্র এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতাই প্রবল।

হ্যাঁ, আপনার নিকট যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তা আপনার অন্তরে বদ্ধমূল হবে, তবে অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য দো‘য়া করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

“যারা তাদের পরে এসেছে,তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু’।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

চতুর্থ কারণ:

গবেষকদের নিকট নির্ভরযোগ্য নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হলো, সনদের পাশাপাশি মতনকেও গুরুত্ব দেওয়া;

বর্ণনাসমূহের সনদের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়ার পর তার মতনসমূহ পর্যালোচনা করা এবং বর্ণনাসমূহ আল-কুরআনে বর্ণিত নস ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সামনে পেশ করা। অনুরূপভাবে বর্ণনাসমূহকে একত্রিত করা। এটাই বিশেষজ্ঞদের গবেষণা-পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহকে পর্যালোচনা খুবই জরুরি। কিন্তু খুবই দুঃখজনক গবেষকগণ সনদ পর্যালোচনাকে উপেক্ষা করেন এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রেওয়ায়েত বা বর্ণনাসমূহকেই যথেষ্ট মনে করেন!! আর যারা সনদকে গুরুত্ব প্রদান করেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মতনসমূহ ও তার সাথে কুরআনের বিরোধ বিষয়ে পর্যালোচনার ব্যাপারে বরাবর উদাসীন।

সম্মানিত পাঠক:

যে কোনো সিদ্ধান্ত ও অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করার পূর্বে আবেগ তাড়িত বিদ্বেষ পরিহার করুন এবং আমি এখানে যে দলীল-প্রমাণগুলো পেশ করেছি, সেগুলো

অধ্যয়ন করুন। এগুলো সুস্পষ্টভাবে শক্তিশালী অর্থসহ প্রচলিত নয়। সুতরাং এগুলো বাস্তব অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত নস বা দলীলের শক্তি হলো সূরা 'আল-ফাত্হ'-এর শেষ আয়াতের মতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ [الفتح: ٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের

বর্ণনা এইরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে বের হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষির জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

“যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু’।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

সুতরাং আয়াত তিলাওয়াত করুন এবং তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

প্রথম পাঠ

নামকরণের তাৎপর্য

নাম হচ্ছে নামকরণকৃত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত। এটা এমন এক শিরোনাম, যা একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করে। মানুষের স্বভাব নামকরণের কার্যক্রম চালু করেছে। নামের গুরুত্ব প্রত্যেক বিবেকবান মাত্রই সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করেন। কারণ, নামের মাধ্যমে শিশু পরিচিত হয়; তার ভাই ও অন্যান্যদের থেকে পৃথক হয় এবং তার জন্য ও পরবর্তী বংশধরের জন্য হয় নিশানা। মানুষ শেষ হয়ে যায় কিন্তু নাম অবশিষ্ট থাকে। اسم শব্দটি سُمُوٌّ শব্দ থেকে নির্গত, অর্থ- علو (উচ্চতা, মর্যাদা) অথবা وَسم শব্দ থেকে নির্গত, অর্থ- علامة (চিহ্ন; নিদর্শন; লক্ষণ)। প্রত্যেকটি অর্থই নবজাতকের নামকরণের গুরুত্ব বহন করে।

পিতার নিকট নামের গুরুত্ব সুস্পষ্ট। এর থেকে তার দীন-ধর্ম ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, আপনি শুনেছেন কি, খ্রিস্টান অথবা ইহুদীরা তাদের সন্তানদের নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাখে??

অথবা কোনো পথভ্রষ্ট ছাড়া মুসলমানরা তাদের সন্তানদের নাম লাত-ওজ্জা রাখে?

নামের মধ্য থেকেই পিতার সাথে ছেলের বন্ধন তৈরি হয়। পিতা ও পরিবার-পরিজন তাদের সন্তানদের এমন নামে ডাকে, যে নামটি তারা নির্বাচন করেছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নামের ব্যবহার বেশি। প্রাচীনযুগে বলা হত:

من اسمك أعرفُ أباك

“তোমার নাম থেকেই আমি তোমার পিতাকে চিনি।”[5]

ইসলামে নামের গুরুত্ব

নামের ব্যাপারে শরী”আত যে গুরুত্ব দিয়েছে, নামের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য তাই যথেষ্ট। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের একটি বিশেষ অংশের নাম পরিবর্তন

[5] বকর আবদুল্লাহ আবু যায়দ, তাসমিয়াতুল মাওলূদ।

করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকুল আমলাক (রাজাদের রাজা) ও অনুরূপ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ»

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তির নাম, যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক।"[6]

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রাহমান'-এর মত করে নাম রাখার জন্য বলেছেন; যার মধ্যে নামকরণকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আল্লাহর দাসত্বের ঘোষণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أحبُّ الأسماءِ إلى الله تعالى عبدُ الله، وعبدُ الرحمن».

[6] মুসনাদ আস-সাহাবা ফিল কুতুবিস-তিস'আ

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান।”[7]

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো নামে আনন্দিত হতেন এবং তাকে সু-লক্ষণ মনে করতেন।

উসুল ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিকট স্বীকৃত যে, প্রতিটি নামই তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। এ বিষয়ে ভাষা ও উসুলে ফিকহ সংক্রান্ত কিতাবসমূহে আলিমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতদসংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েলের সংখ্যা অনেক।

---

[7] সহীহ মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ।

উপলব্ধি করবে কী?

সম্মানিত পাঠক:

ব্যস্ত হবেন না, অবাক হবেন না, বরং আমার সাথে পাঠে ও প্রশ্ন-উত্তরে অংশগ্রহণ করুন:

- কেন আপনি আপনার সন্তানের নাম রাখবেন?

- আপনি কি আপনার সন্তানের জন্য এমন একটি নাম বাছাই করবেন, যা আপনার নিকট অথবা তার মা ও পরিবার-পরিজনের নিকট প্রিয় অর্থবোধক হবে?

- আপনি কি আপনার শত্রুদের নামে সন্তানের নাম রাখবেন?

সুবহানাল্লাহ!

আমরা আমাদের নিজেদের জন্য এমন নাম নির্বাচন করব, যা আমাদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। আর যারা ভালো মানুষের অন্তর্ভুক্ত, নামের ভালো-মন্দ বিচার করে আমারা কি তাদেরকে বর্জন করব? আমরা বলব: না। কারণ, তারা তাদের সন্তানদের নাম নির্বাচন করেছে

সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ বা প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে!! নাম নির্বাচনটা তাদের নিকট কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল না!!

জাতির পণ্ডিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বংশ ও ব্যক্তিত্বে সম্মানিত ব্যক্তিগণ এমন ব্যক্তিকে সম্মান করেন, যার মানবিক মূল্যবোধ বেশি। সুতরাং এটা তাদের প্রতি উদারতা নয় যে, তারা তাদের প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি ভালোবাসা ও মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের নামে তাদের সন্তানদের নামকরণ করে থাকে; বরং তারা তাদের শত্রুদের নামেও তাদের কোনো কোনো সন্তানের নামকরণ করে!! আপনি এটা সমর্থন করেন কি?

নির্দিষ্ট নামের জন্য নামকরণের বিষয়টি কোনো একক ব্যক্তির জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নয়, বরং সকল সন্তান-সন্ততির জন্যই এই নামকরণ। আর বহু যুগ পরে পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে যাওয়ার পর নামকরণ-পদ্ধতি চালু হয়েছে, এ কথাও ঠিক নয়। বরং নামকরণ-পদ্ধতি চালু হয়েছে পারস্পরিক শত্রুতার চরম সময়ে। তারা

(পণ্ডিতবর্গ) এরূপ ধারণাই পোষণ করেন। আমরা বলি, বরং ভালোবাসার স্বর্ণযুগে নামকরণ-পদ্ধতি চালু হয়েছে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা, যাকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আলোচনা-পর্যালোচনা খুবই জরুরি। কারণ, এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে; আছে বিভিন্ন উপকথা, কল্পকাহিনী ও মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনীর জবাব; আরও আছে ব্যক্তিকে সম্বোধন ও আবেগের বিষয় এবং পণ্ডিতগণ কর্তৃক পণ্ডিতগণকে পরিতুষ্টকরণ। সুতরাং নামকরণের এ বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা বা ভিন্ন ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ব্যাপার।

এবার আপনার লক্ষ্য ঠিক করুন

১-৩. সাইয়্যেদেনা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের বাকি তিন খলিফাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাদের নামে তাঁর কয়েকজন সন্তানের নাম রেখেছেন। তারা হলেন:

- আবু বকর ইবন আলী ইবন আবি তালেব: তার ভাই হোসাইনের সাথে কারবালায় শহীদ হন (তাদের ওপর ও তাদের নানার ওপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম)।
- উমার ইবন আলী ইবন আবি তালেব: তার ভাই হোসাইনের সাথে কারবালায় শহীদ হন (তাদের ওপর ও তাদের নানার ওপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম)।
- ওসমান ইবন আলী ইবন আবি তালেব: তার ভাই হোসাইনের সাথে কারবালায় শহীদ হন (তাদের ওপর ও তাদের নানার ওপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম)।

৪-৬. হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সন্তানদের নাম রেখেছেন আবু বকর ইবন হাসান, উমার ইবন হাসান এবং তালহা ইবন হাসান। আর তারা সকলেই তাদের চাচা হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সাথে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন।

৭. হোসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সন্তানের নাম রেখেছেন উমার ইবন হোসাইন।

৮. ৯. তাবেঈদের সরদার চতুর্থ ইমাম আলী ইবন হোসাইন যাইনুল আবেদীন তার কন্যার নাম রাখেন ‘আয়েশা, আর ছেলের নাম রাখেন উমার। তার পরেও তার বংশধর রয়েছে[8]।

অনুরূপভাবে আববাস ইবন আবদিল মুত্তালিব, জা‘ফর ইবন আবি তালেব, মুসলিম ইবন ‘উকাইলের বংশধরসহ আহলে বাইতের অপরাপর সদস্যগণও তাদের সন্তানদের নামকরণ করেছেন। এখানে ঐসব নাম অনুসন্ধানের অবকাশ নেই; বরং যা উল্লেখ করলে কাঙ্খিত বিষয়ের ওপর ইঙ্গিত করে, তা উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। আর আলী,

---

[8] দেখুন, কাশফুল গুম্মাহ, খ.২, পৃ. ৩৩৪। আল-ফুসূলুল মুহিম্মাহ, পৃ. ২৮৩; অনুরূপভাবে বার ইমামের সকলের সন্তানের মধ্যেই এ ধরনের নাম পাওয়া যাবে। শিয়া আলেমরা নিজেরাও এ ব্যাপারে কথা বলেছেন এবং এ নামগুলো উল্লেখ করেছেন। ইয়াওমুত-তফ পৃ. ১৭-১৮৫। আরও দেখুন, আ‘লামুল ওরা, লিত তাবরাসী, পৃ. ২০৩; ইরশাল লিল মুফীদ, ১৮৬; তারীখে ইয়া‘কূবী, খ.২, পৃ. ২১৩।

হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার সন্তানদের কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার পরিবার-পরিজন তাদের সন্তানদের এসব নামে নামকরণ করেছেন, শিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ তা অস্বীকার করে। এটা ঐ ব্যক্তির কাজ, নাম ও বংশ সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান নেই এবং বই-পত্রের সাথে যার সম্পর্ক সীমিত। আর তারা সংখ্যায় নগণ্য। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

প্রখ্যাত ইমাম ও শিয়া মতাবলম্বী আলেমদের পক্ষ থেকে তাদের মতামত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কারণ, ঐসব নামের ব্যাপারে অকাট্য দলীল রয়েছে; রয়েছে তাদের বংশধরদের অস্তীত্ব এবং শিয়া সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের মধ্যে এসব নাম পাওয়া যায়। এমনকি কারবালার দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে বর্ণিত বর্ণনাসমূহেও এসব নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া ইমাম হোসাইনের সাথে শাহাদাত বরণ করেন আবু বকর ইবন আলী ইবন আবি তালেব, আবু বকর ইবন হাসানসহ যাদের নাম ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে ইমাম হোসাইনের সাথে ঐসব নাম শিয়া সম্প্রদায়ের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে সত্য, কিন্তু আপনি হোসাইনিয়াত (الحسينيات) ও আশুরার দিনে শোক প্রকাশের সময় এসব নাম শুনতে পাবেন না। তাদের নাম উল্লেখ না করার অর্থ এই নয় যে, তাদের আস্তিত্ব নেই। অপরদিকে উমার ইবন আলী ইবন আবি তালেব ও উমার ইবন হাসান ছিলেন অশ্বারোহী সৈন্য, তারা উভয়ে আশুরার দিনের ঘটনায় শহীদ হন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইমামগণ কর্তৃক আবু বকর, উমার, ওসমান, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমূখ প্রখ্যাত সাহাবীদের নামে তাদের সন্তানদের নামকরণের মাসআলাটি। আমরা এই মাসআলার কোনো পরিতুষ্টকারী সন্তোষজনক জবাব শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে পাব না। আমাদের দ্বারা এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, এসব নামের কোনো অর্থ ও তাৎপর্য নেই। আবার মাসআলাটির ব্যাপারে এ কথাও বলা অসম্ভব যে, এটি একটি ষড়যন্ত্র

যা আহলে সন্নাত ওয়াল জামা'আত শিয়াদের কিতাবসমূহে সৃষ্টি করেছে! কারণ, এ কথার অর্থ হলো, তাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। সুতরাং প্রত্যেক বর্ণনার ক্ষেত্রেই শিয়াদের পক্ষে এ কথা বলা অসম্ভব নয় যে, এটি একটি চক্রান্ত!! বিশেষ করে তাদের প্রত্যেক আলিমের বর্ণনা গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে তাদের নিকট কোনো নিয়ম-নীতি নেই। হাস্যকর ও বেদনাদায়ক দিক হলো যখন বলা হয়: ইতঃপূর্বে যাদের আলোচনা হয়েছে, প্রখ্যাত সাহাবীদের নামে তাদের নামকরণ করা হয়েছে তাদেরকে গালি-গালাজ ও তিরস্কার করার জন্য।

হায়! সুবহানাল্লাহ, আমাদের জন্য বৈধ হবে কি এ কথা বলা যে, ইমাম এমন অনেক কাজ করেন যার দ্বারা তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ ও সাধারণ জনগণ প্রতারিত হয়??

এই জন্য কীভাবে ইমাম তাঁর বংশধরকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবেন??

তারাই বা কারা, যাদেরকে ইমাম এসব নাম দ্বারা ধোঁকা দেবেন?

তাঁর বীরত্ব ও মান-সম্মানই অস্বীকার করবে নিজেকে ও তাঁর সন্তানদেরকে অপমানিত করতে বনী তাঈম বা বনী ‘আদী অথবা বনী উমাইয়ার জন্য। ইমামের জীবনী পাঠক সত্য সত্যই উপলব্ধি করতে পারবে যে, নিশ্চয় ইমাম হলেন মহাবীর। বিপরীতে মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে তৈরি হয় ভীরু কাপুরুষ, যে দীন-ধর্ম ও মান-সম্মান রক্ষায় প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। ঐ জাতির কিতাবসমূহের অধিকাংশ বর্ণনা খুবই দুঃখজনক!!

ফলাফল:

ইমামগণ যা প্রমাণ করলেন: আহলে বাইত কর্তৃক খোলাফায়ে রাশেদীন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবীর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার শক্তিশালী দলীল ও বাস্তব উদাহরণ হলেন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার সন্তানগণ। আর আপনি নিজেও এ বাস্তবতাকে স্বীকার করবেন। সুতরাং একে

প্রত্যাখ্যান করার কোনো সুযোগ নেই। এই বাস্তবতাকে সমর্থন করে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ‘ ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

প্রিয় পাঠক! অনুরোধ করছি, আয়াতটি বারবার আবৃত্তি করুন, অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করুন এবং দয়া বা সম্প্রীতির গুণটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

দ্বিতীয় পাঠ

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা

সম্মানিত পাঠক:

আপনার কলিজার টুকরা, হৃদয়ের স্পন্দন কন্যাটিকে কার হাতে তুলে দেবেন? তাকে কোনো লম্পট অপরাধীর হাতে তুলে দিতে রাজি হবেন কি? صهري বা نسيبي (আমার আত্মীয়) বলতে আপনি কি বুঝেন?

مصاهرة শব্দের আভিধানিক অর্থ:

مصاهرة **শব্দটি** صاهر **শব্দের** ক্রিয়মূল, বলা হয়: صاهرت القوم إذا تزوجت منهم; আযহারী বলেন, الصهر **শব্দটি** নারীপক্ষের নিকটাত্মীয় মুহার্রাম নারী-পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি। বিয়ের পূর্বের নিকটাত্মীয় মুহার্রামগণও নারীর আত্মীয় বলে গণ্য হবে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তির আত্মীয় মানে তার স্ত্রীরও আত্মীয়, কোনো স্ত্রীর আত্মীয় মানে তার স্বামীরও আত্মীয়। এক

কথায় مصاهرة শব্দের আভিধানিক অর্থ: নারীর নিকটাত্মীয়, কখনও কখনও পুরুষের আত্মীয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এ সম্পর্কটি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤﴾ [الفرقان: ٥٣]

“এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৩]

এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, কীভাবে আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির একজনকে অন্যজনের সাথে বংশগত ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। সুতরাং বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা একটি শর‘ঈ বন্ধন, যাকে আল্লাহ বংশের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর বংশ হলো পিতার নিকটাত্মীয়। কোনো কোনো আলিমের মতে, বংশ বলতে সকল নিকটাত্মীয়কে বুঝায়। স্মরণ

রাখবেন, আল্লাহ النسب (বংশ) এবং الصهر (বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা) একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এটি একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করবেন না।

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার ঐতিহাসিক দিক:

আরবদের নিকট বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ, তারা পরস্পর বংশ ও আত্মীয়তা নিয়ে গর্ব-অহংকার করার দর্শনে বিশ্বাসী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাদের জামাতাদের মান-মর্যাদা নিয়ে গর্ব-অহংকার করা| আরবদের আরও একটি প্রশিদ্ধ রীতি হলো, তাদের চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির সাথে তাদের সন্তানদের বিয়ে-সাদী দিত না। তবে অনারবের বহু গোষ্ঠীর মাঝে উঁচু-নীচু ব্যবধানে বিয়ে-সাদী চলে। আর পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের নিকট আজ-কাল বর্ণবৈষম্যকে মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আর আরবরা তাদের রমণীদেরকে উত্ত্যক্ত করত। যেমন তাদের কেউ কেউ লজ্জার ভয়ে তাদের কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত। এ কারণে তাদের মধ্যে রক্তপাত হত এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লেগে যেত। পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য দীর্ঘ বক্তব্যের চেয়ে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তার প্রভাব আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে, যা আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় হে পাঠক।

ইসলামে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা:

ইসলাম এসে উন্নত কাজ-কর্ম ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অপকর্ম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তাকওয়া বা খোদাভীতিই বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ﴾ [الحجرات: ١٣]

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

এটাই শর‘ঈ মানদণ্ড।

আপনি দেখতে পাবেন, ফকীহগণ দীন-ধর্ম, বংশ, পেশা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুফু (সমতা) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ হওয়ার জন্য কুফুর শর্ত বিবেচ্য বিষয় কি না? এটা কি স্ত্রীর অধিকার? অথবা তাতে অভিভাবকের অংশগ্রহণ থাকবে কি না? ইত্যাদিসহ বিবাহ প্রসঙ্গে আরও অনেক আলোচনা রয়েছে।

নারীদের মান-সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা সংক্রান্ত মাসআলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন হলো, তিনি স্বীয় মান-সম্মান রক্ষায় নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এমন এক নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য, যার পর্দা নিয়ে জনৈক ইয়াহূদী তামাশা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বনু কায়নুকার মধ্যকার বিদ্যমান চুক্তি ভঙ্গের প্রসিদ্ধ কাহিনী রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ হলো:

জনৈক ইয়াহূদী তার নিকট থেকে স্বর্ণ ক্রয় করতে আসা এক বালিকাকে চেহারা উন্মোচন করার প্রস্তাব দিলে সে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর ঐ ইয়াহূদী বালিকার কাপড়ের এক প্রান্তে গিট দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সে বসা অবস্থায় তা উপলব্ধি করতে পারে নি। অতঃপর সে দাঁড়ালে তার কাপড় উন্মোচন হয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিক সে সাহায্য চেয়ে চিৎকার করতে থাকে। তার কাছেই ছিল এক মুসলিম যুবক। অতঃপর সে ঐ ইয়াহূদীর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করল। অপরদিকে ইয়াহূদীরা ঐ যুবকের ওপর সম্মিলতভাবে হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলল।

এর সাথে আরও অনেক কারণ তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যা তাদের পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তির লঙ্ঘন বলে প্রতিয়মান হয়।

সম্মানিত পাঠক:

শরী'আতের কিছু বিধানের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করুন। যেমন, বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক ও সাক্ষীর শর্ত,

অপবাদের শাস্তির বিধান, যিনা-ব্যভিচারের শাস্তির বিধান ইত্যাদির কী হিকমত ও প্রভাব রয়েছে। আরও চিন্তা করুন এসব বিধানের মধ্যে কী অপূর্ব শরী'আত রয়েছে। ফলে আপনার নিকট এ বিষয়টির গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার ওপর অনেকগুলো বিধান বিন্যস্ত। বিয়ে সম্পাদনের বিধানটি নিয়ে চিন্তা করুন যে, কোনো পুরুষ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলে তার জন্য কতগুলো নিয়ম-কানূন থাকে। অতএব, তার প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান উভয় হতে পারে, প্রস্তাবিত বিষয়টি কার্যকর করার জন্য প্রস্তাবক তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের সহযোগিতা কামনা করবে, মেয়ের অভিভাবকবৃন্দ ও পরিবার-পরিজন প্রস্তাবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং তাদের জন্য সেই প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে। এমন কি যদি প্রস্তাবক কোনো উপহার সামগ্রী অথবা অগ্রীম মোহর বা অনুরূপ কিছু পরিশোধ করে, বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন না হলে তবুও তারা প্রস্তাবককে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

তাছাড়া বিয়েতে সাক্ষী রাখা জরুরি, আর বিয়ের সংবাদ প্রচার করা শরী'আতের দাবি। যখন বিয়ের বিধানসমূহ কার্যকর হয়, তখন তা দূরবর্তীদেরকে নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করে। বিয়ের কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে সম্মান করে স্থায়ীভাবে অথবা যতক্ষণ স্ত্রী তার জিম্মাদারীতে থাকে। এই পুস্তিকার কারিকুলামে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নেই। আসল উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তুলে ধরা। সুতরাং নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন:

হাসান ও হোসাইনের বোনকে তার পিতা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট বিয়ে দেন। সুতরাং আমরা কি বলব যে, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার কন্যাকে উমারের ভয়ে তার নিকট বিয়ে দেন? তাহলে তার বীরত্ব কোথায়? মেয়ের প্রতি তার ভালোবাসা কোথায়? তিনি কি তার কন্যাকে যালিমের হাতে তুলে দিলেন? আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তার আত্মমর্যাদাবোধ কোথায়? এভাবে অনেক প্রশ্ন, যার

শেষ নেই। না কি আপনি বলবেন, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার কন্যাকে উমারের সাথে আগ্রহসহকারে সন্তুষ্ট চিত্তে বিয়ে দেন। হ্যাঁ, উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এক কন্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরী‘আতসম্মত বিশুদ্ধ পন্থায় বিবাহ দেন, যাতে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই[9]। আর এ বিয়েটি প্রমাণ করে উভয় পরিবারের মধ্যে কেমন ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার স্বামী। সুতরাং উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ের পূর্বেই উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান।

দ্বিতীয়ত: উদাহরণ হিসেবে ইমাম জাফর সাদিকের কথা পেশ করা যায়, তিনি বলেন, “আবু বকর আমাকে দুইবার

---

[9] অচিরেই আমরা শিয়া আলেমদের বর্ণনা উল্লেখ করব, যা এ বিয়েকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং প্রত্যেক দোষ অন্বেষণকারীর দোষ খণ্ডন করবে।

জন্ম দিয়েছেন।” জাফরের মা কে আপনি জানেন কি? তিনি হলেন ফারওয়া বিনতে কাসেম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবি বকর।[10]

হে বুদ্ধিমান! কেন জাফর রহ. মুহাম্মদ ইবন আবি বকর না বলে শুধু আবু বকর বললেন??? হ্যাঁ, তিনি আবু বকর নামটি স্পষ্ট করে এ জন্যই বলেছেন যে, শিয়াদের কেউ কেউ তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করে। অথচ তার ছেলে মুহাম্মদের মর্যাদার ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায় একমত। অতএব, আল্লাহর কসম! আপনি ভেবে দেখুন, মানুষ কাকে নিয়ে গর্ব-অহংকার করে?

সম্মানিত পাঠক:

আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে পরস্পর বংশগত আদান-প্রদান তথা বিয়ে-সাদীর বিষয়টি এমন প্রত্যেকেই জানে, তাদের বংশবিদ্যায় যার জানা-শুনা আছে, এমন কি

---

[10] তার মা হলেন আসমা বিন্ত আবদির রহমান ইব্ন আবি বকর।-দ্র. উমদাতুত তালেবীন, তেহরান, পৃ.১৯৫; আল-কাফী, খ.১, পৃ. ৪৭২।

তাদের গোলামরাও তা জানে। হ্যাঁ, গোলামরা পর্যন্ত কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ও শরীফ বংশে বিয়ে করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যায়েদ বিন হারেছা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তিনিই একমাত্র সাহাবী যার নাম আল-কুরআনের সূরা আল-আহযাবে আলোচনা হয়েছে। কে তার স্ত্রী? তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা।

আরও একজন হলেন উসামা বিন যায়েদ, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের ফাতেমা বিনতে কায়েসের সাথে বিয়ে দেন।[11]

আবু হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অপর এক গোলাম সালেমকে তার ভাতিজী হিন্দা বিনতে ওয়ালিদ ইবন উতবা ইবন রবি‘আর সাথে বিয়ে দেন। তার পিতা ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম নেতা।[12]

---

[11] সহীহ মুসলিম, ফাতেমা বিনত কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত।

[12] সহীহ বুখারী, ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত।

সাহাবীদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার আলোচনা অনেক দীর্ঘ। খোলাফায়ে রাশেদীন ও আহলে বাইতের মধ্যে সংঘটিত বিয়ে-সাদী নিয়ে ছোট-খাট কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করছি।

আপনি জানেন যে, সাইয়্যেদেনা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাকে বিয়ে করেছেন।

জাফর সাদিক রহ.-এর মা, যার আলোচনা পূর্বে হয়েছে, তার বড় দাদী কে? তারা উভয় হলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নাতনী।

সম্মানিত পাঠক:

শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে হিফাযত করুন, গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুন। কারণ, আপনি মুসলিম আর জ্ঞান-বুদ্ধির মর্যাদা আপনার কাছে অস্পষ্ট নয়। যে আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। এগুলো আলোচনার স্থান এখানে নয়।

এ জন্য আমাদের উচিৎ আমাদের বিবেক দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং যারা আমাদের বিবেক নিয়ে খেল-তামাশা করে, তাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করা। মানুষ ও জিন শয়তান থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, যিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

সম্মানিত পাঠক:

আপনার গোষ্ঠীর সকলের নাক ধূলামলিন হোক। আপনার পিতা ও পিতৃপুরুষদেরকে গালি দেওয়া হলে আপনি কি খুশি হবেন? আপনি মেনে নেবেন কি যদি বলা হয় যে, নারীদের সরদারকে বল প্রয়োগ করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে? এভাবে অসংখ্য প্রশ্ন যার শেষ নেই।

কোনো বিবেক মেনে নেবে এসব অনর্থক পেঁচানো কথা? কোনো হৃদয় গ্রহণ করবে এসব বর্ণনা? আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ না রাখেন। হে আল্লাহ! তোমার সকল নেক বান্দার প্রতি আমাদের ভালোবাসা

দান কর, হে সারা জাহানের রব! তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল কর।

তৃতীয় পাঠের পূর্বে:

ধরুন, শিয়া সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য আলেমদের নিকট নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে কিছু নস, যাতে সকলের মতে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কন্যা উম্মে কলসুমের সাথে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বিয়ের বিষয়টি প্রমাণিত।

ইমাম সফী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন তাজ উদ্দীন যিনি ইবন আল-তকতকী আল-হাসানী (মৃ. ৭০৯ হি.) বলে পরিচিত; বংশ তালিকা বিশারদ, ঐতিহাসিক ও ইমাম, তিনি তার কিতাবে বলেন, যা হালাকুর সঙ্গী আসীল উদ্দীন হাসান ইবন নাসির উদ্দীন আল-তুসীকে হাদিয়া দেন। তার নামেই কিতাবটির নামকরণ করা হয়। তিনি আমীরুল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কন্যাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "আর উম্মে কলসুম, তার মাতা হলেন ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম;

তাঁকে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বিয়ে করেন। অতঃপর যায়েদ নামে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন জাফর তাকে বিয়ে করলেন” (পৃ. ৫৮)। মুহাক্কিক সাইয়্যেদ মাহাদি আল-রাজায়ীর বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি কতগুলো বর্ণনা পেশ করেন। তন্মধ্যে উমার ইবন আলী ইবন হোসাইনের প্রতি নেসবত করে আল্লামা আবুল হাসান আল-ওমরীর একটি সমালোচনামূলক বক্তব্য রয়েছে, যা তার ‘আল-মাজদী’ নামক কিতাবে উদ্ধৃত। তিনি বলেন, “কিছুক্ষণ পূর্বে এই বর্ণসমূহের ওপর ভিত্তি করে যা অনুধাবন করলাম, তা হলো আববাস ইবন আবদিল মুত্তালিব তাকে তার পিতার সম্মতি ও অনুমতিক্রমে ওমরের সাথে বিয়ে দেন এবং উমার তার ওরশে যায়েদ নামে এক সন্তানের জন্ম দেন।”

সমালোচক আরও অনেক কথার অবতারণা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শয়তান উমার তাকে বিয়ে করেছে অথবা সে তার সাথে সংসার করে নি অথবা সে তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে বিয়ে করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লামা মাজলিসী বলেন, “..এভাবে আসল ঘটনাকে অস্বীকার করা হয় অসমর্থীত বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে। তবে এসব সংবাদ (শীঘ্রই সনদসহ যার বর্ণনা আসছে), উমার যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উম্মে কুলসুমকে তার বাড়িতে নিয়ে আসেন ইত্যাদি ধরণের বর্ণনা যখন ‘বাহরুল আনোয়ার’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়, তখন বাস্তবকে অস্বীকার করা রীতিমত আশ্চর্যজনক। সুতরাং এর জবাব হলো, এ ঘটনাগুলো ঘটছে তাকিয়া (সত্য গোপন) ও বাধ্যকরণ...পদ্ধতিতে।”[13]

আমি বলি: ‘কাফী’ গ্রন্থকার তার কিতাবে অনেকগুলো হাদীসের আলোচনা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলো: (সংসার করা স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে কোথায় সে ইদ্দত পালন করবে এবং সে ব্যাপারে কি জওয়াব অধ্যায়: হুমাইদ ইবন যিয়াদ বর্ণনা করেন ইবন সামা‘আ থেকে, তিনি বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ থেকে, তিনি

---

[13] মিরাআতুল ‘উকুল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫।

বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ ইবন সিনান ও মুয়াবিয়া ইবন আম্মার থেকে, তারা বর্ণনা করেন আবু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তিনি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ মহিলা সম্পর্কে যার স্বামী মারা গিয়েছে, সে কি তার ঘরে ইদ্দত পালন করবে, না কি যেখানে খুশি সেখানে ইদ্দত পালন করবে? তিনি বললেন: বরং যেখানে খুশি সেখানে ইদ্দত পালন করবে। কারণ, উমার যখন ইন্তিকাল করে, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উম্মে কুলসুমকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন।[14]

সম্মানিত পাঠক:

বিয়ের ব্যাপারে আমি শিয়া সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক আধুনিক আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, এ প্রসঙ্গে কতগুলো সুন্দর জবাব রয়েছে যা উত্তরাধীকার ও ওয়াকফ সংক্রান্ত কোর্টের বিচারপতি শাইখ আবদুল হুমাইদ আল-খুতাঈ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

---

[14] দ্র. আল-কাফী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

“ইসলামের মহাবীর ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক স্বীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দিয়ে কোনো অপরাধ করেন নি। কারণ, তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুসলমানের জন্যই উত্তম আদর্শ। অথচ রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বিয়ে করেছেন। আর আবু সুফিয়ান উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। আর বিয়েটিকে কেন্দ্র করে যে কাদা ছোড়াছুড়ি করা হয়, সাধারণত তার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

আর উম্মে কুলসুমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তোমাদের কথা ‘শয়তান খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বেশ ধারণ করেছে’, এটা একটা হাস্যকর ও বেদনাদায়ক কথা। তার শানে এমন কথা বলা বা অর্থ করা ও যুক্তি দাঁড় করানো কোনোটাই উচিৎ নয়।

মনগড়া বানানো এসব খারাপ কথাগুলো যদি আমরা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করি, তবে তা থেকে এমন অনেক কিছু দেখতে পাব, যা হবে হাস্যকর ও বেদনাদায়ক।"

আর শাইখ এটাকে আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেন নি, বরং এটা হচ্ছে পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার তাৎপর্য ও গুরুত্বে ওপর ইঙ্গিত। আর এ ধরণের বন্ধন উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত হতে পারে না। এতে আছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের নিদর্শন।

প্রিয় পাঠক! আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় যে, বিয়ের বিধানে পরিষ্কার পার্থক্য হলো, মুসলিম পুরুষের জন্য কিতাবী (আহলে কিতাব) মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ, আর কিতাবী পুরুষ আর মুসলিম রমণীর মধ্যে বিয়ে বৈধ নয়। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করুন।

সারসংক্ষেপ

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বিশেষ করে ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বংশধর ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বংশধরের মধ্যে। অনুরূপভাবে ইসলামপূর্ব ও পরবর্তী যুগে বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের মধ্যেও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বজনসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ উদাহরণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু সুফিয়ানের কন্যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বিয়ে। (দেখুন কিতাবের শেষে সংযুক্তি।)

এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং সফল সমাজের কিছু দিক ও বিভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় দিক হলো দুই আত্মীয়ের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন। তাছাড়া আরও অনেক প্রভাব রয়েছে, আশা করি পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে, তাই যথেষ্ট হবে

এবং যা আলোচনা হয় নি, তার প্রয়োজন হবে না।

আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করছি।

তৃতীয় পাঠ

প্রশংসা ও গুণগানের তাৎপর্য

হে সম্মানিত পাঠক:

ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও আপনার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও গ্রাম ছেড়ে কখনও প্রবাস জীবনযাপন করেছেন কি?

প্রবাস জীবনের বছরগুলো কীভাবে কাটিয়েছেন?

তাদের সাথে অথবা আপনার প্রিয়জনদের সাথে কখনও সেনানিবাসে জীবনযাপন করেছেন কি?

সম্মানিত পাঠক:

বিবেক ও আবেগের সমন্বয়ে একই বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আপনি যাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, আপনার ঐসব সঙ্গীদের সাথে যুলুম-নির্যতন ও অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন-যাপন করেছেন কি? উপরিউক্ত সকল অবস্থানে যে ব্যক্তি জীবনযাপন করে, তার ব্যাপরে আপনার অভিমত কী? আর সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন

সুখে-দুঃখে পরস্পর মহব্বতের সাথী, বরং তাদের সাথে আরও ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, বিশেষ করে ইসলাম গ্রহণে অগ্রজ সাহাবীগণ উপরিউক্ত ঐ অবস্থানে জীবনযাপন করেছেন। তবে হ্যাঁ, তাদের সামাজিক জীবন ছিল বিভিন্ন রকম, তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রত্যেক সীরাত পাঠকই তাদেরকে চিনতে পারবেন অথবা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারের প্রতি তাদের ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ-উদ্দীপনা।

সম্মানিত পাঠক:

সম্ভবত আপনি এসব কাহিনী পাঠ করেন। আসুন, আমার সাথে ইতিহাসের গভীরতার দিকে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আরকামের বাড়িতে ছিলেন, আর দাওয়াত ছিল গোপনীয় অবস্থায়। অতঃপর যখন সেখানে ইসলাম প্রকাশ হলো; অতঃপর যখন তাঁর প্রিয় সাহাবীরা দূর দেশ হাবশায় হিজরত করল এবং তার পরে

মদিনায় হিজরত করল। তারা ছেড়ে গেলেন পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও মাতৃভূমিকে। উটে আরোহণ করে, কখনও পায়ে হেঁটে কষ্টকর এই দূর সফরে তাদের অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখুন। ভেবে দেখুন, যখন তারা সকলেই খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনাতে আতংকিত ও অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করেছিলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় অতিক্রম করেছিলেন নির্জন মরুপ্রান্তর এবং জীবনযাপন করেছেন বদর, খন্দক, খায়বর, হুনায়েন ও তার পূর্বে মক্কাবিজয়সহ অন্যান্য বিজয়ের ময়দানে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা:

হ্যাঁ, ভেবে দেখুন, তাদের মধ্যে পাস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন কেমন ছিল? আপনার স্মৃতির দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হবে না এই বিষয় যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে তাদের সেনাপতি, মুরব্বী ও শিক্ষক হিসেবে জীবনযাপন করেছেন। আপনার স্মৃতিপটে যেন ভেসে উঠে, আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আল-কুরআন

অবতীর্ণ হচ্ছে এই দলের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তাদের ব্যাপারে চিন্তা করুন, যাদের হৃদয় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে। আরও ভেবে দেখুন, সংঘবদ্ধ এই দলের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব নিয়ে, রাসূলের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যাদের হৃদয় একত্রিত হয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে বসবাস করছেন, আর তাদের ওপর আল-কুরআন নাযিল হচ্ছে। আমার সাথে আপনিও ঐ অবস্থান ও দিনগুলো নিয়ে কল্পনা করুন।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবত’ (صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم) নামক প্রথম পুস্তিকায়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, শান্তি, ঐক্য ও মহববত ছিল তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا...﴾ [ال عمران: ١٠٣]

“তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তেমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে...।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

উদার মনের হতে হলে এ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণ করুন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এই সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, “তিনি তাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন।” আর এটা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ওপর এক বড় অনুগ্রহ। আর আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো প্রতিরোধকারী নেই।

হ্যাঁ, আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই

শত্রুতাকে দূর করে দিলেন এবং তার পরিবর্তে তাদেরকে ভালোবাসা ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

সম্মানিত পাঠক:

এতে বিশ্বাস করলে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রতি আপনার ধারণা সুন্দর করলে কী ক্ষতি হবে?

তাদের জন্য তাদের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর তারা পরস্পর ভাই হয়ে গেল তাদের বিশুদ্ধ হৃদয় দিয়ে, যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলো সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও ঐক্য। এই উপদেশ কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রীত নয়, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত। আর নিম্নোক্ত আয়াত উপদেশের ব্যাপকতাই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٢ وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡۚ لَوۡ أَنفَقۡتَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مَّآ

أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٣﴾
[الانفال: ٦٢، ٦٣]

“যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু’মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬২-৬৩]

হে সম্মানিত পাঠক! আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং তা বারবার তেলাওয়াত করুন। কারণ, এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও ঈমানদারদের দ্বারা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি গুরুত্বসহকারে আমাদেরকে বলছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দুনিয়ার সকল

সম্পদ ব্যয় করতেন, তাহলেও এই অর্জন সম্ভব হত না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই হলেন এই অনুগ্রহের একমাত্র মালিক। এতদসত্বেও এমন লোক পাওয়া যাবে, যে এই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং নসসমূহের বিরোধির জন্যই তার প্রবৃত্তি তা অস্বীকার করে।

ধারণা করা হয়, পারস্পরিক শত্রুতাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। অথচ আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ পরিবেশন করছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে ও তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রতীর বন্ধন তৈরি করেছেন, তাদেরকে পরস্পরের ভাই বানিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছেন। এতদসত্ত্বেও ইতিহাসের পাতায় বারবার আলোচিত হচ্ছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল।

সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রশংসায় বহু আয়াতের অবতারণা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর তাদের গুণাবলী ও কর্মকান্ডের বর্ণনায় আরও আয়াত রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতটি তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾ [الحشر: ٨، ٩]

“এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা

মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮-৯]

পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে, তাতে আল-কুরআনের কিছু নসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সংখ্যায় তা অনেক। যেসব নস তাদের পরস্পর মহববতের ওপর আলোকপাত করে এবং ভালোবাসার অস্তিত্বের ওপর জোর দেয়, আমরা সেগুলোর ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। আর এই ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে গ্রন্থিত। যেমনিভাবে আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় যে, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসাসহ এ ধরণের অর্থবোধক প্রতিটি বিষয়ে কুরআনের নস বর্ণিত আছে। আর তা ভালোবাসার গুণটির ওপর জোর দেয়। এ বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত

অধিকাংশ নসই সুস্পষ্ট। পূর্বের আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তাতে রয়েছে মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের ভালোবাসার প্রমাণ। সূরা আল-ফাতাহ'র শেষ আয়াতটি নিয়েও চিন্তা-গবেষণা করুন।

তারপর এই কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা করুন, যা আলী আল-আরবালী তার "كشف الغمة" নামক (২য় খণ্ড, তেহরান, পৃ. ৭৮) গ্রন্থে ইমাম আলী ইবন হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইরাক থেকে ইমামের নিকট এক দল লোক আসল, অতঃপর তারা আবু বকর, উমার ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ব্যাপারে নানা কথা বলল; তারপর তাদের কথা শেষ হলে ইমাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তেমরা কি আমাকে সংবাদ দেবে? তোমরাই কি প্রথম সারির মুহাজির, (যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী)? তারা বলল: না, অতঃপর তোমরা কি তারাই, (মুহাজিরদের

আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও)? তারা বলল: না, তিনি বললেন: জেনে রাখ, তোমরা যদি এই দুই দলের কেউ না হয়ে থাক, তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরও কেউ নও, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, (তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না।) তেমরা আমার কাছ থেকে বের হও, আল্লাহই তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।

এটা যাইনুল আবেদীন ইবন আলী ইবন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার উপলব্ধি। আর তিনি ছিলেন তাবে‘য়ী। আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহ, অনুরূপভাবে শিয়াদের কিতাবসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের পরস্পরের প্রশংসায়। "نهج البلاغة" নামক কিতাবের

পাঠক অনেক বক্তব্য ও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাবে, যার প্রত্যেকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রশংসায় উদ্ধৃত। সেখান থেকে কুরআনের আয়াত সংবলিত একটি বক্তব্য নির্বাচন করেছি।

ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের দেখেছি; কিন্তু তোমাদের কাউকে তাদের মত মনে হয় না। তাদের সকাল হত আলুথালু অবস্থায়, তাদের রাত অতিবাহিত হত সাজদাবনত ও দাঁড়ানো অবস্থায় এবং পালাক্রমে ইবাদত ও বিশ্রামে। আল্লাহর কথা স্মরণ হলে তাদের অশ্রুসিক্ত হত, এমন কি তাদের গলদেশ পর্যন্ত ভিজে যেত। আর তারা শাস্তির ভয়ে ও সাওয়াবের আশায় কেঁপে উঠত, প্রবল ঝড়ের দিনে যেমনিভাবে গাছ কেঁপে উঠে।

সাহাবীদের প্রশংসায় ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কথা অনেক দীর্ঘ। তার নাতী ইমাম যাইনুল আবেদীনের একটি পুস্তিকা আছে, তাতে তিনি তাদের (সাহাবীদের)

জন্য দো‘আ ও প্রশংসাসূচক বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর আপনি তাতে সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রশংসায় ইমামদের পক্ষ থেকে দেওয়া অনেক বক্তব্য পাবেন। আর তাদের থেকে অনেক রেওয়ায়েত এসেছে, যাতে স্পষ্ট ভাষায় খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মুহাতুল মুমিনীন (মুমিন জননী) ও অন্যান্য সাহাবীদের প্রশংসা রয়েছে। এগুলো একত্রিত করা হলে কয়েক খণ্ডের প্রয়োজন হবে।

সম্মানিত পাঠক:

সংক্ষিপ্ত করার একান্ত আশা-আকঙ্খা থাকলেও আপনার নিকট অনেক কথা বলা হয়ে গেল। আশা করি এটাকে আমার অপারগতা বলে মনে করবেন, আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা আমাকে ও আপনাকে উপকৃত করেন। কিন্তু বাস্তব বিষয়টি পরিপূর্ণতা সহকারে বর্ণনা করা খুবই জরুরি। আশা করি আপনি ধৈর্যসহকারে আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকবেন। কারণ, এ পুস্তিকাটি অচিরেই শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মতে আহলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদের অবতারণা হলো, যাতে আল্লাহ তাওফীক দিলে আপনি জানতে পারেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চরম আগ্রহসহকারে আল-কুরআনকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে। অনুরূপভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনকেও আদর্শ হিসেবে আকড়ে ধরেন। এ মাসআলাটি স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। আর তাদের মধ্যে তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনও রয়েছে; বিশেষ করে যারা তাঁর সাথে একই পোষাকে প্রবেশ করেছে। আগামী অনুচ্ছেদে তাদের কিছু হকের ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ (র.) স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আলে বাইত-এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের অবস্থান

আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ: آل البيت মানে أهل الرجل (ব্যক্তির পরিবার); আর التأهل মানে: التزويج (বিয়ে দেওয়া); এ কথাগুলো খলিল বলেন[15]। আর أهل البيت মানে: ঘরের অধিবাসী, আর أهل الاسلام মানে ইসলাম ধর্মের অনুসারী[16]।معجم مقاييس اللغة নামক অভিধানে آل শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়: "آل الرجل: أهل بيته"[17]

ইবনু মানজুর বলেন, آل الرجل أهله , آل الله و رسوله: أولياؤه অর্থাৎ آل الرجل বলতে ব্যক্তির পরিবার এবং آل الله و رسوله বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুদের বুঝানো হয়। آل শব্দটি মূলে ছিল أهل, অতঃপর "ه" -কে "ء" দ্বারা পরিবর্তন করে "أأل" হয়েছে। অতঃপর দুই হামযা (ء) একত্রিত হওয়ায় দ্বিতীয় হামযাকে ألف দ্বারা পরিবর্তন

---

[15] দেখুন, কিতাবুল আইন, খ. ৪, পৃ. ৮৯।

[16] আস-সিহাহ, খ. ৪, পৃ. ১২২৮; লিসানুল আরব, খ. ১১, পৃ. ২৮।

[17] মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ, খ.১, পৃ. ১৬১।

করা হয়েছে[18]। آل শব্দটি মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পির্কিত। সুতরাং " آل الحائك " (তাঁতীর বংশ) বলা যাবে না। এটা أهل শব্দের বিপরীত। সুতরাং বলা হবে " أهل الحائك"; بيت الرجل মানে ব্যক্তির বাড়ি-ঘর ও মর্যাদা।[19] যখন বলা হয় "البيت", তখন আল্লাহর ঘর কা'বাকে বুঝায়। কারণ, অন্তরসমূহ, বিশেষ করে মু'মিনদের অন্তরসমূহ তার দিকেই ধাবিত। আত্মাসমূহ তার মধ্যেই শান্তি পায়। আর এটা হলো কেবলা। জাহেলী যুগে " أهل البيت" বলতে বিশেষ করে কা'বার অধিবাসীদেরকে বুঝানো হত। ইসলাম পরবর্তী যুগে "أهل البيت" বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনকে বুঝায়[20]।

---

[18] লিসানুল আরব, খ. ১১, পৃ. ৩১। অনুরূপ ইস্পাহানী, মুফারাদাতু ফী গরিবিল কুরআন, পৃ. ৩০।

[19] লিসানুল আরব, খ. ২, পৃ. ১৫।

[20] মুফারাদাতু ফী গরিবিল কুরআন, পৃ. ২৯; শাইখুল ইসলাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. এ ব্যাপারে "জালাউল আফহাম ফিস সালাতে আলা

আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে কী বুঝায়?

আলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের সীমানা নির্ধারণে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে:

1. অধিকাংশের মতে, তারা হলেন যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

2. তারা হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান-সন্ততি ও পবিত্র স্ত্রীগণ। ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন'-এ এই মতটি পছন্দ করেছেন। এই মতের প্রবক্তাদের কেউ কেউ তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে বাদ দিয়েছেন।

খাইরিল আনাম" শীর্ষক, একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং যিনি এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তিনি এ বিষয়ে রচিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে, আহলে সুন্নাতের আলিমগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

3. কিয়ামত পর্যন্ত যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে, তারাই হলেন নবী পরিবার। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নববী এই মত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থকারও এই মতের প্রবক্তা। ওলামাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকারীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গই নবী পরিবার বলে খ্যাত।

তবে প্রথম মতটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

প্রশ্ন: কাদের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ?

তাঁরা হলেন বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব। এ কথাটিই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। অধিকাংশ আলিম এই মতের প্রবক্তা। কোনো কোনো আলিম বনু মুত্তালিবকে বাদ দিয়ে শুধু বনু হাশেমের কথা বলেন। শিয়া মতাবলম্বী 'আল-ইমামিয়া আল-ইছনা আশারীয়া'-দের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর বলতে শুধু বার ইমামকে বুঝায়, অন্য কেউ নন। আর তাদেরকে নিয়ে শাখা-

প্রশাখায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, এত বিস্তারিত আলোচনার জায়াগা এখানে নয়। এই মাসআলা নিয়ে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বড় ধরণের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, যার কারণে তারা বহু দলে বিভক্ত হয়েছে। (নওবখতী'র كتاب فرق الشيعة-য় দ্রষ্টব্য)

আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের আকিদা-বিশ্বাস

আপনি এমন কোনো আকিদার বই পাবেন না যাতে আকিদা বা বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলার অন্তর্ভূক্তি নেই। বরং আপনি তাতে এই মাসআলার ব্যাপারে নস পাবেন। এটা এ জন্য যে, তার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আলেমগণ এ মাসআলাটিকে আকিদা সম্পর্কিত মাসআলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ে অনেক স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করেছেন।

আহলে সুন্নাতের আকীদার ব্যাপারে সারসংক্ষেপ হলো- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রহ. العقيدة الواسطية নামক গ্রন্থে খুব সংক্ষেপে বলেন, আহলে সুন্নাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসেন, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন। যেমন কূপ পরিষ্কার করার দিন তিনি বলেন,

«أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي»

“তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!! তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!!![21]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ এসেছে যে, কুরাইশদের কেউ কেউ বনু হাশিমকে উৎপীড়ন করে, তখন তিনি তাঁর চাচা আববাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله و لقرابتي»

“যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা

---

[21] মুসলিম ও অন্যান্যগণ।

তোমাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও আমার আত্মীয়তার কারণে।”[22]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

“নিশ্চয় ইসমাঈল সন্তান থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন; কেনানা গোত্র থেকে কুরাইশ গোত্রকে মনোনীত করেছেন, কুরাইশ গোত্র থেকে বনু হাশিমকে মনোনীত করেছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।”[23]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার পক্ষে জবাব হিসেবে এই নসটিই যথেষ্ট। কারণ, তার منهاج السنة নামক গ্রন্থটির কারণে অধিকাংশ শিয়া মতাবলম্বী তাঁকে আহলে সুন্নাতের পক্ষে

---

[22] আহমদ, ফি ফাদায়েলিস সাহাবা।

[23] সহীহ মুসলিম।

তাদের চরম শত্রু মনে করত। তিনি ইবনুল মুৎহার আল-হাল্লী'র জবাবে এই বইটি লেখেন।

আর তাদের অধিকারের বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথমত: ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের অধিকার

হে সম্মানিত পাঠক! আপনার নিকট অস্পষ্ট নয় যে, প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর জন্য তাদের প্রতি ভালোবাসা একটি শর'ঈ কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের যে আলোচনা পূর্বে হয়েছে, তা বিশেষ ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব যাতে নবী পরিবার ব্যতীত অন্য কেউ অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার আত্মীয়তার কারণে (لقرابتي)। প্রথমত আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব, তা হচ্ছে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। আর তা সকল মুসলমানের অধিকার। কারণ, মুসলিম মুসলিমের ভাই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও সকল মুসলিম এর অন্তর্ভুক্ত হবে। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়তার কারণে তাদের সাথে বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ﴾ [الشورا: ٢٣]

“বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।” [সূরা আল-শূরা, আয়াত: ২৩]

আয়াতের যথাযথ অর্থের ওপর ভিত্তি করেই পূর্বোক্ত হাদীসের এই অর্থ। কারণ, তাফসীরকারকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে বিধায় তোমরা আমাকে ভালোবাস। কারণ, গোটা কুরাইশ গোত্রের সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক। মোটকথা, তাদের প্রতি ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন সবকিছুই তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে। আর এটা ইসলামের অনুসারীদের সাধারণ বন্ধুত্ব নয়।

দ্বিতীয়: তাদের প্রতি সালাত ও সালামের অধিকার

অনুরূপভাবে তাদের প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾ [الاحزاب: ٥٦]

"আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]

ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ গ্রন্থে আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সা'দ ইবন উবাদা'র মজলিসে অবস্থান করা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে হাযির হলেন, অতঃপর বশির ইবন সা'দ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠের নির্দেশ

দিয়েছেন, সুতরাং আমরা কীভাবে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করব? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন, এমন কি আমরা আশ্বস্ত হলাম যে, তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলবে:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»

(হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছেন সারা

জাহানব্যাপী। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত। আর সালাম তা সেভাবে পেশ করবে, যেভাবে তোমরা তা শিখেছ।)[24]

অনুরূপ হাদীস আবু হুমাঈদ আস-সা'য়িদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন। এ বিষয়ে আরও অনেক দলীল রয়েছে।

ইবনু কাইয়্যেম রহ. বলেন, ইমামদের ঐক্যমতে এটা শুধু তাদেরই অধিকার, অপরাপর উম্মতগণ এর অন্তর্ভুক্ত নয়[25]।

আর এই দো'আটি দুরূদে ইবরাহীমের মধ্যেও আছে।

তৃতীয়ত: খুমুসের অধিকার

---

[24] সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ খ. ১, পৃ. ৩০৫, নং ৪০৫।

[25] জালাউল আফহাম গ্রন্থে আরও বিস্তারিত দেখুন।

অনুরূপভাবে তাদের জন্য গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশের (خمس) অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الانفال: ٤١]

“আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪১]

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। আর এটা রাসূলের স্বজনদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ। তাদের জন্য এ নির্দিষ্ট অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরেও বলবৎ রয়েছে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত এবং এটাই বিশুদ্ধ।[26]

প্রসঙ্গ-কথা: অধিকার অনেক। আমরা গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের দিকে ইঙ্গিত করেছি। যার ইসলাম গ্রহণ ও বংশ নিশ্চত হবে, তিনিই শুধু এই অধিকারসমূহের অধিকারী হবেন। সুতরাং তাদের জন্য এই বিষয়টি জরুরি এবং উত্তম আমলও জরুরি।

আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সতর্ক করতেন। যেমন মক্কার এক প্রসিদ্ধ ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب

---

[26] দ্রষ্টব্য আল-মুগনী, ৯/২৮৮। আহলে বাইতের হক বর্ণনায় শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ-এর একটি ছোট গ্রন্থ রয়েছে, যা আবু তুরাব আয-যাহেরী তত্ত্বাবধান করে প্রকাশ করেছেন।

لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا».

“হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের নফসকে ক্রয় করে নাও (জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নাও)। আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। হে বনি মান্নাফ! আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। হে আববাস ইবন আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সুফিয়া! আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ! আমার সম্পদ থেকে তুমি যা খুশি আমার নিকট চাও; কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না।”[27]

---

[27] সহীহ বুখারী।

আর আবু লাহাবের ব্যাপারে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তো সকলেই জানে। আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ চাই।

নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান

ফায়দা: আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্তির পর আমরা নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করছি। আর তা নিম্নরূপ:

نصب শব্দের আভিধানিক অর্থ:

কোন জিনিস প্রতিষ্ঠা করা ও উপরে তুলে ধরা। এর থেকে বলা হয়: "ناصبة الشر والحرب" (মন্দ ও যুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতা)।

القاموس অভিধানে:

النواصب والناصبة وأهل النصب: المتدينون ببغض علي رضي الله عنه,لأنهم نصبوا له , أي عادوه অর্থাৎ النواصب বা أهل النصب

হচ্ছে: আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ঘৃণা করার নীতি অবলম্বনকারী। কারণ, তারা তাঁর সাথে শত্রুতা করে।

এই হচ্ছে নামকরণের ভিত্তি। সুতরাং যে কেউ নবী পরিবারের সাথে শত্রুতা করে, সে নাওয়াসিব (النواصب)-এর অন্তর্ভুক্ত।

সম্মানিত পাঠক:

ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সন্তানদের প্রশংসায় ইসলামী চিন্তাবিদদের বক্তব্য পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। আমাদের আকীদা হচ্ছে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী, হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম নি'আমতে ভরপুর জান্নাতের অধিবাসী। এটা পরিষ্কার কথা। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এখানে নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান এবং আহলে সুন্নাত যে নাওয়াসিব (نواصب)-এর চিন্তাধারা থেকে মুক্ত, সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ মাসআলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা।

কারণ, এটা উম্মতের মধ্যে বহু দলে বিভক্তি ও মতানৈক্যের কারণ। এমন দল বা উপদল পাওয়া যায়, যারা এইসব ফেরকাবাজীর মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা হাসিল করে, তারা কারণে অকারণে আলোচনা করে কী কারণে এসব ফেরকা বা বিরোধের আগুন জ্বলে উঠে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকটি কথা বিরোধের আগুনকে আরও শানিত ও বেগবান করে। আর এসব কথা হচ্ছে নির্ভেজাল অপবাদ ও ডাহা মিথ্যা।

সুতরাং আপনি এমন আলোচক পাবেন, যে অপবাদ দেয় যে, আহলে সুন্নাত ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সন্তানদেরকে অপছন্দ করে এবং ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আহলে সুন্নাত ঘৃণা করে এমন মনগড়া কাহিনী ও বর্ণনা উপস্থাপনের দ্বারা তার অবস্থানকে সুন্দর করে। আর আহলে সুন্নাত তার (আলী) মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেন। সুতরাং আপনি এমন কোনো হাদীসের কিতাব পাবেন না, যাতে ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ফযীলত ও মর্যাদার আলোচনা নেই।

সম্মানিত পাঠক:

নাওয়াসিব (نواصب) প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (র.)-এর বক্তব্য উপস্থাপন করাই যথেষ্ট। আহলে সুন্নাতের এই আলেমকে শিয়া সম্প্রদায় তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। আর তিনি শিয়াদের জবাবে বড় এক সুন্নী বিশ্বকোষ রচনা করেছেন।

ইবন তাইমিয়্যা রহ. বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে গালি ও অভিশাপ দেওয়া বিদ্রোহ বা সীমা লংঘনের শামিল। যে গোষ্ঠী এই কাজটি করবে, তাদেরকে বলা হবে বিদ্রোহী দল বা গোষ্ঠী (الطائفة الباغية) যেমন ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রন্থে ইকরামা থেকে (পূর্ণ সনদে) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা আমাকে ও তার পুত্র আলীকে বললেন, তোমরা আবু সা'ঈদের নিকট যাও এবং তাঁর থেকে হাদীস শোন! আমরা গিয়ে দেখলাম তিনি প্রাচীর সংস্কার করছেন। তিনি তাঁর চাদর দিয়ে শরীর পেঁচিয়ে নিলেন। অতঃপর

তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন, যখন মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গ আসল, তখন তিনি বললেন: আমরা এক ইট এক ইট করে বহন করতাম, আর ‘আম্মার দুই ইট দুই ইট করে বহন করত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর থেকে ধূলিবালি ঝেড়ে ফেলেন আর বলেন,

«ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»

“আফসোস আম্মারের জন্য, তাঁকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে, সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে, আর তারা তাঁকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে।” বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আম্মার বলল: আমি সকল প্রকার ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

ইমাম মুসলিম রহ.ও আবু সা‘ঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (আমার চেয়ে যিনি উত্তম) আমাকে সংবাদ দেন যে, আম্মার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন পরিখা খনন করা শুরু করেন,

তখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা মুছতে মুছতে বললেন:

«بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ».

“সুমাইয়ার ছেলের জন্য কষ্ট, তোমাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।”

ইমাম মুসলিম রহ. আরও বর্ণনা করেন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

“আম্মারকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।”

এসব দলীলও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নেতৃত্বের বিশুদ্ধতা ও তার আনুগত্য করার অপরিহার্যতার ওপর প্রমাণ করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্যের দিকে আহ্বানকারী, সে জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী; আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে যুদ্ধ করার দিকে আহ্বানকারী, সে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী। যদিও সে ভিন্ন

ব্যাখ্যাদানকারী বা কল্যাণকামী হউক না কেন। এটাই তার প্রমাণ যে, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। (আর এর ওপর ভিত্তি করে দুই শ্রেণির যোদ্ধা- কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যা করে ভুলক্রমে তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে; আবার কেউ বিনা ব্যাখ্যায় বিদ্রোহী হিসেবে যুদ্ধ করেছে।) আমাদের নিকট দুই কথার মধ্যে এটাই বিশুদ্ধ। আর তা হলো, যে আলীর সাথে যুদ্ধ করেছে, সে ভুলে করেছে। আর এটাই ফকীহ ইমামদের মত, যারা এর ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বিদ্রোহীদের যুদ্ধকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেছেন।[28]

ইবন তাইমিয়্যার নিম্নোক্ত কথাটি নিয়ে চিন্তা করুন:

ইয়াযিদ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বক্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মাসআলা সম্পাদনা এবং এ বিষয়ে সর্বসাধারণের ইখতিলাফ বর্ণনার পর তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি হোসাইনকে হত্যা করল অথবা হত্যায়

[28] মাজমু‘ ফতওয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রহ. খ. ৪, পৃ. ৪৩৭।

সহযোগিতা করল অথবা হত্যায় সম্মতি জ্ঞাপন করল, তার ওপর আল্লাহর লা‘নত, সমস্ত ফিরিশতার লা‘নত এবং সমস্ত মানুষের লা‘নত।”[29]

সুতরাং এর পরও কোনো খতীব বা আলিমের পক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের সমালোচনা করা সম্ভব হতে পারে কি যে, সে বলবে, তারা (আহলে সুন্নাত) نواصب বা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে শত্রুতা পোষণকারী।

---

[29] প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪৮৭।

অনুচ্ছেদ

প্রিয় ভাই: এই পুস্তিকায় যা পাঠ করলেন, তা নিয়ে কখনও কখনও আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে; আরও প্রশ্ন জাগতে পারে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর মধ্যে সংঘটিত সিফফীন ও উষ্ট্রের যুদ্ধ নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে যা প্রমাণিত, তা নিয়ে। কারণ, প্রত্যেক দলেই তাদের কোনো উপদল বা তাদের সবাই কিংবা তাদের অধিকাংশ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সাথে ছিল; যেখানে ছিলেন নবী পরিবারের লোকজনও। আর এ বিষয়টি নিয়ে একটি বিশেষ অভিসন্দর্ভ রচনার দাবি রাখে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই সমস্যাটির বাস্তব সমাধান তুলে ধরে একটি পুস্তক রচনায় আমাকে সাহায্য করেন।

তবে আমাকে ও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن

فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ... ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে; যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই...।" [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯-১০]

সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও তাদের ঈমান প্রমাণিত। আর আয়াতটি সুস্পষ্ট, কোনো টীকাটীপ্পনি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। অতএব, তারা সকলেই মুমিন, যদিও তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী:

﴿...فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ...﴾ [البقرة: ١٧٨]

“...কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা বিধেয়...।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮]

এই বিধানটি ইচ্ছকৃত হত্যার বিষয়ে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে ঈমানী ভ্রতৃত্ববোধ অটুট রেখেছেন। সুতরাং জঘন্য হত্যাকারীর অপরাধের যে কঠিন শাস্তির কথা আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন, তা তাদেরকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করবে না। তারা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের সাথে পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ...﴾ [الحجرات: ١٠]

“মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই...।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০]

বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের দাবি রাখে যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি আল্লাহ খুব কাছাকাছি সময়ে এর সমাধান করে দেবেন ইনশা'আল্লাহ।

উপসংহার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা কৃতার্থ করেছেন।

হে প্রিয়তম!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিয়ে গবেষণায় জীবনযাপন করার পর আমরা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, আত্মীয়তার বন্ধন, বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তরিকতার বন্ধন ইত্যাদি উপলব্দি করেছি, যা আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং আমাদের উচিৎ জগতসমূহের রবের নিকট প্রার্থনায় সচেষ্ট হওয়া, যাতে তিনি আমাদেরকে তাঁর পছন্দসই ও সন্তোষজনক কাজ করার তাওফীক দেন এবং আমাদেরকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের ব্যাপারে তিনি তাঁর কিতাবে মুহাজির ও আনসারদের

প্রশংসা করার পর আলোচনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

“যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু’।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

যেমনিভাবে যাইনুল আবেদীন রহ. বলেন, “ইরাক থেকে ইমামের নিকট এক দল লোক আসল, অতঃপর তারা আবু বকর, উমার ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম-এর ব্যাপারে নানা কথা বলল, তারপর তাদের কথা শেষ হলে ইমাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তেমরা কি আমাকে সংবাদ দেবে? তোমরাই কি প্রথম সারির মুহাজির, (যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী)[30]? তারা বলল: না, অতঃপর তোমরা কি তারাই, (মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও)[31]? তারা বলল: না, তিনি বললেন: জেনে রাখ, তোমরা যদি এই দুই দলের কেউ না হয়ে থাক, তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরও কেউ নও, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, (তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ

---

[30] সূরা আল-হাশর: ৮।

[31] সূরা আল-হাশর: ৯।

রেখো না।)[32] তেমরা আমার কাছ থেকে বের হও, আল্লাহই তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।” (কাশফুল গুম্মা, ২য় খণ্ড, তেহরান, পৃ. ৭৮)

যতই দলীল-প্রমাণসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হউক, মানুষ কিন্তু তাঁর অভিভাবক আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন উজ্জ্বল মু‘জিযাসমূহ ও আলকুরআনুল কারীম দ্বারা যাকে আল্লাহ সুস্পষ্ট আলো বলে আখ্যায়িত করেছেন; সাথে সাথে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র, বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার দক্ষতা, তার ওপর ভিত্তি করে উত্তম প্রকাশক ও বার্তাবাহক, মক্কাবাসী কর্তৃক তাঁর শিশুকাল থেকে নবীরূপে প্রেরীত হওয়া পর্যন্ত আদ্যোপান্ত জানাসহ এতকিছু সত্ত্বেও বহু মক্কাবাসী মক্কাবিজয়পূর্ব পর্যন্ত কুফরের ওপরই রয়ে গেল। সুতরাং আমাদের উচিত

---

32 সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনায়, তাওফীক কামনায়, সত্যের ওপর অটল থাকা ও যেখানে থাকা হউক সত্যকে অনুসরণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। কারণ, হেদায়াতের মালিক হলেন আল্লাহ তা‘আলা।

প্রিয় ভাই আমার:

স্মরণ করুন! আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার জন্য তিনি আপনাকে তলব করবেন এবং সে জন্য আপনাকে আল্লাহর নিকট হিসাবের মুখোমুখী হতে হবে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কালামের ওপর কোনো মানুষের কথাকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে সাবধান হউন। আল্লাহই আপনার জন্য সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তাকে মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও নিরাময় বলে ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে অন্যদের জন্য তাকে বানিয়েছেন অন্ধত্ব। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞۚ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًىۚ﴾ [فصلت: ٤٤]

“বল, মুমিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব।” [সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত: ৪৪]

সুতরাং এই কুরআনের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করুন এবং তাকে আপনার দুই চোখের নিশানা বানান। আল্লাহ আপনাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফিক দান করুন।

হে কল্যাণময়!

সকল সৃষ্টির হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ওপর। এতে মানুষের কোনো অধিকার নেই। তবে সৎকর্মশীলদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে শাফা‘আতের (সুপারিশের) অধিকার থাকবে। আমাদের কর্তব্য হলো মাওলা সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ওপর বাড়াবাড়ি করা ও তাঁর বান্দাদের ওপর হুকুম জারি করা থেকে দূরে থাকা।

আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও অপরাপর সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-দের ভালোবাসি;

বরং তার দ্বারা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল হবে। সুতরাং ভেবে দেখুন।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য হলো, আমাদের অভিভাবক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট প্রার্থনায় সচেষ্ট থাকা, যাতে তিনি আমাদের অন্তর থেকে সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা থাকলে দূর করে দেন; আমদেরকে সত্যের সন্ধান দেন এবং আমাদের নফস ও শয়তানের প্রভাবমুক্ত থাকতে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। তিনি এগুলোর অভিভাবক এবং তার ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহই সকল বিষয়ে ভালো জানেন।

وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم

হাশিমী বংশ ও বাকি ‘আশারা মুবাশ্‌শারা বিল জান্নাত’-এর মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক

হাশিমী বংশ	অন্যান্য বংশ	তথ্যসূত্র
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	আয়েশা বিনতে সিদ্দীক, হাফসা বিনতে উমার, রামলা বিনতে আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু	সকল তথ্যসূত্র দ্বারা প্রমাণিত
উম্মে কুলসুম বিনতে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু	ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু	অনেক তথ্যসূত্র দ্বারা প্রমাণিত এবং এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।
ফাতেমা বিনতে হোসাইন	আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন ওসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু	ইবনু তকতকী, আল-আসল ফী আনসাব আল-তালেবীন, পৃ. ৬৫, ইবন উতবা,

হাশিমী বংশ	অন্যান্য বংশ	তথ্যসূত্র
		উমদাতু আল-তালিব ফী আনসাবে আলে আবি তালিব, পৃ. ১১৮ এবং অন্যান্য
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু সুফিয়া বিনতে আবদিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু	আল-আওয়াম ইবন খুয়াইলদ। ইসলাম পূর্ব যুগে তার ছেলে যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের জন্ম হয়।	শিয়া ও সুন্নীর সকল তথ্যসূত্র দ্বারা প্রমাণিত
উম্মে হাসান বিনতে হাসান ইবন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু	আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের তাকে বিয়ে করেন এবং তার সাথে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত থাকেন। আর যুবায়েরের	শাইখ আববাস আল-কুম্মী, মুনতাহা আল-আ’মাল, পৃ. ৩৪১, শাইখ মুহাম্মদ আল-আ‘লামী আল-হায়েরী,

হাশিমী বংশ	অন্যান্য বংশ	তথ্যসূত্র
	শাহাদাতের পর তার ভাই যায়েদ তাকে সঙ্গে নিয়ে যান।	তারাজীমুন নিসা, পৃ. ৩৪৬ ও অন্যান্য।
রুকাইয়া বিনতে হাসান ইবন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু	আমর ইবন যুবায়ের ইবন আওয়াম তাকে বিয়ে করেন	শাইখ আববাস আল-কুম্মী, মুনতাহা আল-আ’মাল, পৃ. ৩৪২; শাইখ মুহাম্মদ আল-আ‘লামী আল-হায়েরী, তারাজীমুন নিসা, পৃ. ৩৪৬ ও অন্যান্য।
হোসাইন আসগর ইবন যাইনুল ‘আবেদীন	তিনি খালেদা বিনতে ইবন মুস‘আব ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু	শাইখ মুহাম্মদ আল-আ‘লামী আল-হায়েরী, তারাজীমুন্ নিসা, পৃ. ৩৬১

হাশিমী বংশ	অন্যান্য বংশ	তথ্যসূত্র
	‘আনহু-কে বিয়ে করেন	

তারা ছাড়াও আরও অনেকে আছেন। সকিনা বিনতে হোসাইনের সাথে মুস‘আব ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বিয়ের কাহিনীই এই তালিকার ব্যাপকতা ও প্রসিদ্ধির জন্য যথেষ্ট। আর তাদের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বিষয় অনুসন্ধানে কেউ লেগে থাকলে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে, সে এত বেশি তথ্য উপাত্ত পাবে যা বহু খণ্ডের কিতাবে পরিণত হবে।

উম্মাতের মধ্যে যে মতপার্থক্যের উৎপত্তি হয়েছে তা জানা ও প্রতিকার করা শরী'আতের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য। এটি একটি বৃহৎ বিষয়, যা উম্মতকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। এই গবেষণায়, সাহাবায়ে কেরাম ও আলে বাইত-এর মাঝে যে মধুময় সম্পর্ক ছিল, তার প্রমাণাদি তুলে ধরা হয়েছে উক্ত কিতাবটিতে।